মধ্যযুগে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস

ইউনিট ৬

ভূমিকা

তের শতক থেকে ব্রিটিশ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বাংলায় যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছিল তা ছিল রাজতান্ত্রিক। ১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজির বাংলা বিজয়ের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী । যার ফলে বাংলায় মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্রমাগতভাবে মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশ ঘটতে থাকে। তবে তখন সুলতানি বা নবাবি শাসন ইত্যাদি যে নামে বাংলাকে পরিচিত করা হোক না কেন দেশটা চলত একজন শাসকের ইচ্ছা-অনিচ্ছায়। এখানে সরকার বলতে সুলতান বা রাজাকে বুঝানো হতো। তাদের ছিল একক কর্তৃত্ব। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার তুলনায় মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা স্বৈরতান্ত্রিক, এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক, অগণতান্ত্রিকও। রাষ্ট্র শাসনে ধর্মীয় প্রভাব একচ্ছত্র ছিল। তবে পৃথিবীর সব দেশ বা জাতি মধ্যযুগীয় সামন্ত রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা পার হয়েই আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পৌঁছেছে। বাংলাকেও আমরা তের শতক থেকে ব্রিটিশ শাসন পর্যন্ত রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাই নানা উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠতে দেখেছি। এই ইউনিটে মধ্যযুগে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৬.১ ঃ বখতিয়ার খিলজি ও বাংলায় তুর্কি শাসন
পাঠ-৬.২ ঃ ইলিয়াস শাহ্ ও বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসন
পাঠ-৬.৩ ঃ হোসেন শাহী বংশের অধীনে বাংলা
পাঠ-৬.৪ ঃ বাংলায় মুঘল শাসন ও বার ভূঁইয়া

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

পাঠ-৬.১ বখতিয়ার খিলজি ও বাংলায় তুর্কি শাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বখতিয়ার খিলজির জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বখতিয়ার খিলজির বাংলা বিজয় সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- বখতিয়ার পরবর্তী খিলজি ও তুর্কি শাসন সম্পর্কে বর্ণনা পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	বখতিয়ার খিলজি, নদীয়া, লক্ষ্মনৌতি, ইওয়াজ খিলজি, গিয়াসউদ্দিন বলবন, তুঘ্রিল খান।

বখতিয়ার খিলজির জীবন সংগ্রাম ও উত্থান

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজি তের শতকের প্রথম দিকে বাংলাদেশের একাংশে (প্রধানত নদীয়ায়) মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলাম ধর্মের মোড়কে বাংলায় মুসলিম সভ্যতার আগমন এ দেশের ঐতিহ্যবাহী সমাজ, সংস্কৃতি তথা সামগ্রিক জীবনধারায় গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে। সূচিত হয় এক গভীরতর সাংস্কৃতিক সমন্বয়-সংঘাতের ধারা।

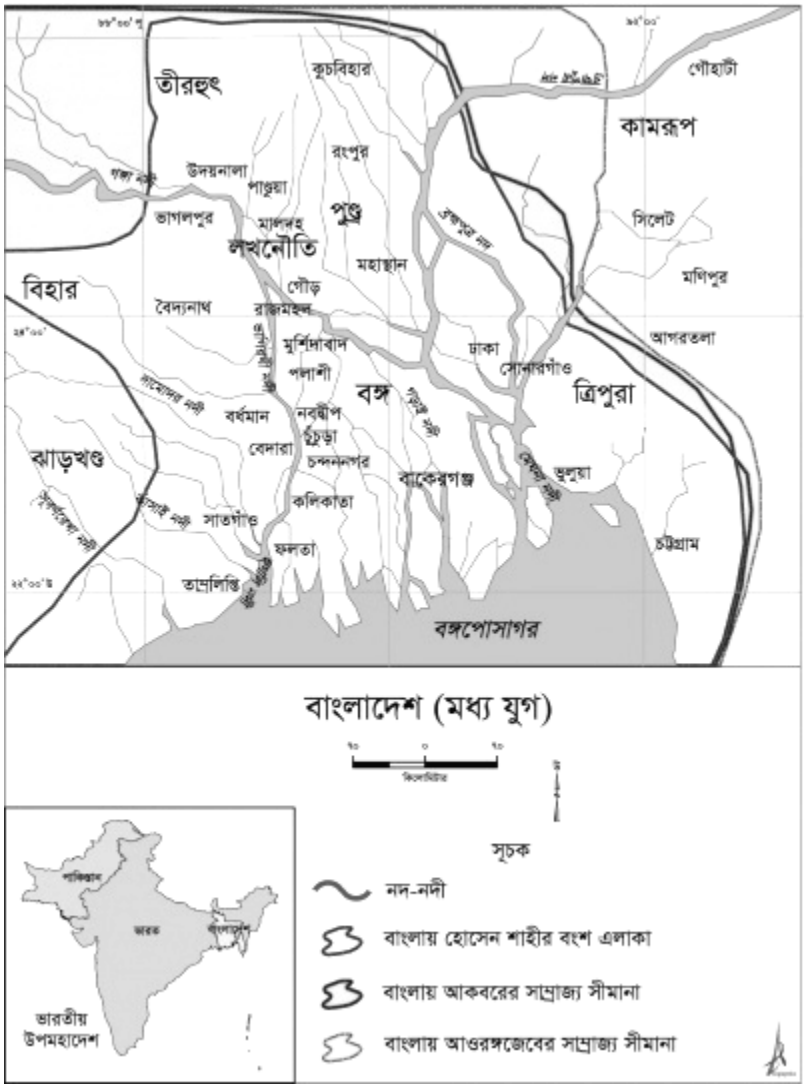

বখতিয়ার খিলজি আফগানিস্তানের গরমশীরের (দস্ত-ই-মার্গ) অধিবাসী ছিলেন। প্রথমে তিনি গজনিতে উপস্থিত হয়ে শিহাবউদ্দীন ঘুরীর অধীনে সৈন্যবিভাগে চাকুরি প্রার্থী হন। তবে শারীরিক কারণে তাঁর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত হয়। গজনিতে বিফল হয়ে তিনি দিল্লিতে চলে যান এবং সেখানকার শাসনকর্তা কুতবউদ্দীন আইবেকের কাছে চাকুরি প্রার্থী হন। কিন্তু কুতবউদ্দীন আইবেকও তাঁর কদাকার চেহারার জন্য তাঁকে সৈন্যবিভাগে চাকুরি দিলেন না। অতঃপর বখতিয়ার বদাউনে যান। সেখানকার শাসনকর্তা মালিক হিজবরউদ্দীন তাঁকে নগদ বেতনে একটি ছোট চাকুরি দেন। তবে অল্প বেতনের এ ছোট চাকুরিতে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তাই তিনি চলে গেলেন অযোধ্যায়। অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক হুসামউদ্দীন বখতিয়ার খিলজিকে সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করেন এবং তাঁকে বিউলী ও ভাগওয়াত নামে দুটি পরগনার জায়গির প্রদান করে উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর জেলায় পাঠিয়ে দেন। মির্জাপুরে জায়গির প্রাপ্তির ফলে বখতিয়ার খিলজির জীবনের মোড় ঘুরে যায়। কারণ, এ অঞ্চলই তাঁর শক্তিকেন্দ্র হয়ে উঠে। এই সময়ে তাঁর সাহস আর উদ্যমের কথা চারদিকে ছড়িয়ে

পড়ে। ফলে চারদিক থেকে ভাগ্যান্বেষণকারী মুসলমানগণ বখতিয়ার খিলজির সাথে যোগ দিতে থাকে ও তাঁর সৈন্য সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়।

বিহার আক্রমণ ও বাংলা (নদীয়া) বিজয়

বখতিয়ার খিলজি শক্তি সঞ্চয় করে আনুমানিক ১২০৩ সালে বৌদ্ধদের একটি আশ্রম ওদন্তপুরি বিহার আক্রমণ করেন। এটি ছিল বৌদ্ধদের বিহার বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এর চারদিকে প্রাচীর বেষ্টিত থাকায় বখতিয়ার খিলজি আশ্রমটিকে দুর্গ মনে করে অবরোধ করেন এবং বিনা পরিশ্রমেই এটি অধিকার করেন। এ বিহারের নামানুসারেই মুসলমানগণ এ অঞ্চলের নাম দেন বিহার। আজও এ অঞ্চল বিহার নামেই পরিচিত।

বখতিয়ার খিলজি বিহার দখল করার পর বাংলার দৃষ্টি দেন। এ সময় বাংলার রাজা ছিলেন সেন বংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সেন। তিনি তখন রাজধানী নদীয়ায় অবস্থান করছিলেন। বখতিয়ার খিলজির নদীয়া আক্রমণের তারিখ নিয়ে বিতর্ক আছে। মতভেদের প্রধান কারণ হলো যে, সমসাময়িক সূত্রে নদীয়া আক্রমণের তারিখ পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকগণ সবদিক বিচার করে বলছেন বখতিয়ার খিলজির ১২০৪-০৫ সালে শীতকালীন সময়ে নদীয়া আক্রমণ করেছিলেন।

বখতিয়ার খিলজি যখন বাংলা বিজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন তখন বাংলাদেশে প্রবেশ সহজ সাধ্য ছিল না। তখন বাংলাদেশে প্রবেশের তিনটি পথ ছিল যথা : ত্রিহুতের পথ, তেলিয়াগার্হির পথ ও ঝাড়খণ্ডের পথ। ত্রিহুতের পথে কয়েকটি খরস্রোতা নদী থাকায় এ পথে কোনো অভিযান পরিচালনা করা খুবই কঠিন ছিল। তেলিয়াগার্হির পথও ছিল বেশ সংকীর্ণ। তবে এ পথেই তখন সাধারণত উত্তর ভারতীয় সৈন্যরা বাংলাদেশে প্রবেশ করত। তৃতীয় পথটি ছিল ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়ে এবং সবচেয়ে বিপদসঙ্কুল। বাংলাদেশে প্রবেশের পথসমূহের বৈশিষ্টাবলি বিবেচনা করে বাংলাদেশের রাজাগণ তেলিয়াগার্হির পথকেই বিশেষভাবে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করতেন। বখতিয়ার খিলজি শুধু দুর্ধর্ষ যোদ্ধাই ছিলেন না, তিনি একজন কৌশলী সমরবিদও ছিলেন। তাই তিনি তেলিয়াগার্হির পথে না এসে ঝাড়খণ্ডের দুর্গম জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হন। তিনি বিরাট বাহিনীকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে নিজে একটি ছোট দলের অগ্রভাগে ছিলেন। কথিত আছে যে, বখতিয়ার খিলজি এতই ক্ষিপ্রতার সাথে অগ্রসর হয়েছিলেন যে, তাঁর সাথে মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী সৈনিক তাল রেখে আসতে পেরেছিলেন। ফলে তিনি যখন নদীয়া পৌঁছলেন, তখন লোকেরা ভাবল যে, কিছু ঘোড়াব্যবসায়ী হয়ত রাজ দরবারে যাচ্ছে। বখতিয়ার খিলজি কোথাও কোনো বাধা না পেয়ে সোজা রাজপ্রাসাদের প্রধান ফটকে গিয়ে উপস্থিত হন। ফলে প্রাসাদ-রক্ষীদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল এবং যে যেদিকে পারল ছুটে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করতে লাগল। ইতোমধ্যে বখতিয়ার খিলজির মূল সৈন্যবাহিনীও শহরের ভেতরে পৌঁছে যায়। এ সময় রাজা লক্ষ্মণ সেন মধ্যাহ্ন ভোজনে বসেছিলেন। খবর পেয়ে তিনি ধরে নেন যে, তাঁর সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয়েছে। তাই তিনি খালি পায়ে পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে নদীপথে পূর্ব-বাংলার বিক্রমপুরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। লক্ষ্মণ সেনের বিপুল ধন-সম্পদ বখতিয়ার খিলজি লাভ করেন। এভাবে নদীয়া অধিকারে করেন বখতিয়ার খিলজি।

লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন ও তিব্বত আক্রমণ

নদীয়া দখলের পর বখতিয়ার খিলজি গৌড় বা লক্ষ্মণাবতীর দিকে যাত্রা করেন। তিনি লক্ষ্মণাবতী অধিকার করে সেখানে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন । এটি মুসলমান আমলে লখনৌতি নামে পরিচিত হয়। বাংলাদেশে বখতিয়ার খিলজি রাজ্য পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া নদী, দক্ষিণে পদ্মা নদী ও উত্তরে দিনাজপুর জেলার দেবকোট হয়ে রংপুর শহর অবধি ছিল। বখতিয়ার খিলজির জীবনের শেষ কাজ তিব্বত আক্রমণ। তবে এ অভিযান সফল হয়নি।

বখতিয়ার খিলজির একজন প্রতিভাধর ব্যক্তি ছিলেন। অতি সাধারণ অবস্থা থেকেই তিনি অল্প সময়ের মধ্যে নিজ প্রতিভাবলে লখনৌতিতে মুসলিম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এ মুসলিম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর জীবনের বড় কৃতিত্ব। ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজের মতে, তিনি কর্মঠ, নির্ভীক, সাহসী, বুদ্ধিমান, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ও দক্ষ সেনাপতি ছিলেন। তিনি বিজিত এলাকায় খুতবা পাঠ ও মুদ্রা প্রচলনের ব্যবস্থা করেন এবং সমগ্র এলাকাকে তাঁর সহকর্মী তুর্কি খিলজি আমীরদের মধ্যে ভাগ করে দেন।

পরবর্তী খিলজি শাসন

বখতিয়ার খিলজির মৃত্যুর পর খিলজি মালিকদের মধ্যে কলহ শুরু হয় । এরপর তিনজন শাসক স্বল্প সময়ের জন্য বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাদের মধ্যে গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খিলজি (১২১২-১২২৭ খ্রি.) বাংলার শাসন, প্রশাসনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বড় অবদান রাখেন। তিনি বাংলার মুসলিম রাজ্যকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এই নবগঠিত রাজ্যের সীমানা বিস্তারে অবদান রাখেন। নদীমাতৃক বাংলায় যুদ্ধ জয়ের জন্য তিনিই সর্বপ্রথম নৌবহর প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাঙালি নাবিকদের সহায়তায় যুদ্ধ জাহাজ চালাবার ব্যবস্থা করেন। তিনি সুশাসক হিসেবেও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি দিনাজপুরের দেবকোট থেকে লখনৌতিতে আবার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন, একই সঙ্গে একটি দুর্গ স্থাপন করে রাজধানীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তিনি পূর্ববাংলা আক্রমণ করে সেখানে তার আধিপত্য বিস্তৃত করেন। বলা চলে বাংলায় তিনি দিল্লির সমান্তরাল আর একটি সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হন যা দিল্লির সুলতান ইলতুতমিশের পছন্দ হয়নি। ইলতুতমিশ তার জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসির উদ্দিন মাহমুদকে ইওয়াজ খিলজির বিরুদ্ধে লখনৌতিতে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে ইওয়াজ খিলজি পরাজিত ও পরে নিহত হন। তখন ইলতুতমিশ নাসির উদ্দিন মাহমুদকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এর ফলে ১২২৭ সালে বাংলা দিল্লির একটি প্রদেশে পরিণত হয়।

বাংলায় তুর্কি শাসন

এ সময় থেকে বাংলার শাসনকর্তারা দিল্লির সুলতানদের কাছ থেকে নিয়োগ লাভ করে এখানকার শাসক হতেন। তাদের মধ্যে অধিকাংশই জাতিগত পরিচয়ে তুর্কি ছিলেন। ১২২৭ থেকে ১২৮১ সাল পর্যন্ত তেমন ১৫ জন তুর্কি শাসক বাংলা শাসন করেছিলেন। তবে বাংলায় দিল্লির অনুগত কোনো শাসনই প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বরং দিল্লির মনোনীত তুর্কি শাসকরাই একের পর এক বিরোধিতা অব্যাহত রাখেন। দিল্লির শাসকরা যেমন, ইলতুতমিশ, বলবন, গিয়াসউদ্দিন তুঘলক ও মুহাম্মদ বিন তুঘলক বাংলার শাসকদেরকে প্রতিহত করতে একের এর এক অভিযান চালিয়ে বিদ্রোহ দমন করেন। এর ফলে দিল্লির শাসনকালে বাংলায় বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ লেগেই ছিল। দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন বাংলার তৎকালীন স্বাধীন শাসক তুগ্রিল খানকে দমনের জন্য নিজেই আক্রমণ (১২৮০-৮১ খ্রি.) করেন। যুদ্ধে তুগ্রিল খান নিহত হন। ফলে বাংলা দিল্লির শাসনাধীন হয়।

১২৮৭ সালে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন মারা গেলে বঘরা খান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ নাম ধারণ করে ১২৯০ সাল পর্যন্ত বাংলার স্বাধীন সুলতান হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৩২৫ সালে দিল্লির শাসক গিয়াসউদ্দিন তুঘলক বাংলা অধিকার করেন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ বখতিয়ার খিলজির সংগ্রামমুখর জীবন এবং তার বাংলা বিজয়ের উপর একটি সচিত্র গল্প রচনা করবেন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে প্রথম মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি। যদিও তার জীবনে অনেক প্রতিকূল পথ পেরিয়ে সফল হন। নদীয়া দখল করে লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন করেন। তার মৃত্যুর পর খিলজি বংশের শাসন দুর্বল হতে শুরু করলে ১২২৭ সাল থেকে বাংলায় তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। (কোন তুর্কি বীর) বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা করেন কে?
ক) বখতিয়ার খিলজি খ) আলী মর্দান খিলজি
গ) শিরান খিলজি ঘ) ইওয়াজ খিলজি

২। বখতিয়ার কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন?
ক) পাকিস্তান খ) আফগানিস্তান
গ) ইরান ঘ) তুরস্ক

৩। বখতিয়ার কুতুবউদ্দিনের সৈন্য বিভাগে চাকুরি লাভে ব্যর্থ হন কোন অবস্থার জন্য?
ক) শারীরিক খ) মানসিক
গ) অর্থনৈতিক ঘ) সামাজিক

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

আজ ২২ নভেম্বর সশস্ত্রবাহিনী দিবস, এদিন চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর এলাকায় বেশ কিছু সমরাস্ত্রসহ যুদ্ধ জাহাজ জনগণের জন্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখা হয়। আয়েশা দাদুর সাথে নৌবাহিনীর কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজ ঘুরে ঘুরে দেখে। এসময় তার মধ্য যুগের এক খিলজি শাসকের কথা মনে পড়ে যিনি নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠায় কাজ করেছিলেন।

৪। উদ্দীপকের আয়শার কোন খিলজি শাসকের কথা মনে পড়ে?
ক) বখতিয়ার খিলজ খ) শিরান খিলজ
গ) গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খিলজ ঘ) আলী মর্দান খিলজ

৫। উক্ত শাসকের নীতি ছিল–
i) রাজ্য সম্প্রসারণ
ii) রাজ্যের নিরাপত্তা
iii) ব্যবসায় বাণিজ্য বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

হোমারের ইলিয়ড মহাকাব্য থেকে নেওয়া গল্পে নির্মিত চলচিত্রে, ট্রয় নগরীর ধ্বংস দেখছিল আকরাম, এক পর্যায়ে দেখা গেল যুদ্ধের কৌশল হিসেবে একজন সেনাপতি তাঁর যোদ্ধাদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে আক্রমণের পরিকল্পনা করছেন। অতঃপর নিজে ১টি ছোট দল নিয়ে জঙ্গলপথে অগ্রসর হয়ে বিপক্ষ দলের রাজপ্রাসাদ আক্রমণ ও দখল করে নেয় যদিও বাকি দলগুলো পেছনেই ছিল।

ক. কোন অভিযান ছিল বখতিয়ার খিলজির জীবনের শেষ সমর অভিযান?
খ. ইওয়াজ খিলজি তার রাজধানী লখনৌতিতে স্থানান্তর করেন কেন?
গ. উদ্দীপকের সেনাপতির যে কৌশল গ্রহণ করেছেন তা পাঠ্য বইয়ের কোন সেনাপতির কর্মের প্রতিফলন? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. আপনি কী মনে করেন, উক্ত সেনাপতি প্রথম জীবনে ব্যর্থ হলেও ভাগ্য নয় কর্মগুণই তাকে সাফল্য এনে দেয়? যুক্তি দেখান।

পাঠ-৬.২ ইলিয়াস শাহ্ ও বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াস শাহ্ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ইলিয়াস শাহের রাজ্য জয়, সুশাসন ও ধর্মীয়ক্ষেত্রে উদারনীতি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সিকান্দর শাহ্, গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ্ ও রাজা গনেশ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ইলিয়াস শাহ্, ফিরুজ শাহ তুঘলুক, রাজমালা, বাঙালা, সিকান্দর শাহ, গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ, রাজা গণেশ

ইলিয়াস শাহী সুলতানগণ বাংলাদেশে প্রায় ১২২ বছর শাসন করেন। এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ সর্বপ্রথম বাংলার বিভিন্ন অংশ একত্রো করেন। এর আগে কোন মুসলমান সুলতান সমগ্র বাংলাদেশকে একত্রো করতে পারেননি। তাই এ আমল থেকেই সমগ্র বাংলাদেশ 'বাঙ্গালা' নামে পরিচিত হয় এবং অধিবাসীরা পরিচিত হয় 'বাঙালি' নামে। ইলিয়াসশাহী সুলতানগণ স্থানীয় জনগণের মন জয় করার জন্য উদারনৈতিক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁরা জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে যোগ্যতার ভিত্তিতে সবাইকে শাসনকার্যে ও সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করেন। তাঁরা দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের সমাদর এবং দেশীয় কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁদের উদার নীতির ফলে বাংলাদেশে সামাজিক জীবনে এক নতুন ধারার সৃষ্টি হয়েছিল। ইলিয়াসশাহী সুলতানগণ আরবদেশ, চীন ও পারস্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন। ইলিয়াসশাহী আমলে বাংলার কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল।

অবশ্য ইলিয়াস শাহী বংশের শাসন সূচনার কিছু সময় আগে বাংলায় স্বাধীন সুলতানি যুগ শুরু হয়। ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ ১৬৩৮ সালে পূর্ব বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। রাজধানী হয় সোনারগাও। একই সময় আলাউদ্দীন আলী শাহ পশ্চিম বাংলায় স্বাধীন সুলতানি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৫২ সালে ইলিয়াস শাহ সোনারগাও দখলের মাধ্যমে দুই বাংলা একত্র করেন।

ইলিয়াস শাহের সিংহাসন লাভ ও রাজ্য বিস্তার

ইলিয়াস শাহ ইরানের অধিবাসী ছিলেন। ইলিয়াস শাহ কীভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে আসেন তার কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। ইলিয়াস লখনৌতির শাসনকর্তা আলী মুবারকের ধাত্রীমাতার পুত্র ছিলেন। পরে আলী মুবারক বাংলাদেশে চলে আসেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই লখনৌতির শাসনকর্তা কদর খানের প্রধান সেনাপতি হন। কদর খান নিহত হওয়ার পর আলী মুবারক লখনৌতিতে ক্ষমতা দখল করেন এবং ইলিয়াস বাংলাদেশে এসে আলী মুবারকের অধীনে উচ্চ পদে কাজ করেন। কিছুদিন পর ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াস আলী মুবারককে হত্যা করে সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইলিয়াস শাহ যখন সিংহাসনে বসেন তখন পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ তার রাজ্যের বাইরে ছিল। তিনি প্রথমে সাতগাও দখল করেন। এরপর ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে নেপাল আক্রমণ করেন ও প্রচুর ধন-সম্পদ লাভ করেন। ইলিয়াস শাহ ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে সোনারগাও অধিকার করে সারা বাংলাদেশের সুলতান হন। তাঁর পূর্বে আর কোনো সুলতান এ গৌরব অর্জন করতে পারেননি। তাই ঐতিহাসিক শামস-ই-সিরাজ আফীফ তাঁকে 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ' ও 'সুলতান-ই-বাঙ্গালাহ' উপাধিতে ভূষিত করেন। পরে ইলিয়াসশাহ জাজনগর (উড়িষ্যা) আক্রমণ করেন এবং ৪৪টি হাতিসহ অনেক ধনসম্পদ লাভ করেন। এরপর তিনি বিহার আক্রমণ করেন এবং আরও পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে চম্পারণ, গোরক্ষপুর ও কাশী জয় করে তাঁর রাজ্যভুক্ত করেন।

ফিরুজ শাহ তুঘলকের সাথে দ্বন্দ্ব

ইলিয়াস শাহের সামরিক সাফল্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কারণ দিল্লির সুলতান ফিরুজ শাহ তুঘলক ১৩৫৩ সালে বাংলাদেশের দিকে অভিযান পরিচালনা করেন। ইলিয়াস শাহের নৌবাহিনী দিল্লির বাহিনীকে বাধা প্রদানের চেষ্টা করে। তবে সুলতান ফিরুজ শাহ অন্যপথে অগ্রসর হয়ে কুশী নদী অতিক্রম করেন। এ খবর পেয়ে ইলিয়াস শাহ রাজধানী

পাণ্ডুয়ায় ফিরে একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এ দুর্গটি যেমন ছিল দুর্ভেদ্য তেমনি ছিল দুর্গম। এর তিনদিকে ছিল নদী এবং অন্যদিকে ছিল ঘন জঙ্গল। তাই ইলিয়াস শাহ বুঝেছিলেন যে, দিল্লি বাহিনীর পক্ষে একডালা দুর্গ জয় করা সম্ভব হবে না। ফিরুজ শাহ একডালা দুর্গ আক্রমণ করেন এবং আপ্রাণ চেষ্টা করেও দুর্গটি অধিকার করতে পারেননি। অবশেষে ফিরুজ শাহ ইলিয়াস শাহের সাথে সন্ধি স্থাপন করে ফিরে যান। সন্ধির শর্তানুসারে উভয়পক্ষের মধ্যে পরবর্তিকালে প্রতিবছর দূত ও উপহার বিনিময় হতো। এর ফলে ইলিয়াস শাহের রাজনৈতিক গৌরব বৃদ্ধি পায়।

ত্রিপুরা ও কামরূপ অভিযান

ফিরুজ শাহের প্রত্যাবর্তনের পর ইলিয়াস শাহ তাঁর রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে মনোনিবেশ করেন। তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের উপর তাঁর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত *রাজমালা* থেকে জানা যায় যে, ত্রিপুরার রাজা তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রত্ন-ফাকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেন। কিন্তু, রাজার মৃত্যুর পর অন্যান্য ভাই রত্ন-ফাকে সিংহাসনচ্যুত করে তাড়িয়ে দেন। রত্ন-ফা বাংলার সুলতান ইলিয়াস শাহের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। ইলিয়াস শাহ তাকে পুনরায় ত্রিপুরার সিংহাসন বসান এবং রত্ন-ফাকে মাণিক্য উপাধি প্রদান করেন। ইলিয়াস শাহ তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করেন এবং কামরূপের কিছু অংশ জয় করেন।

সুশাসন ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে উদার নীতি

ইলিয়াস শাহ সম্ভবত প্রথম সুলতান যিনি স্থানীয় লোকদেরকে অধিক সংখ্যায় সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগ করেন। তাঁর রাজত্বকালে হিন্দুরা উচ্চপদে নিয়োগ লাভ করে। তিনি মুসলমান সুফি এবং দরবেশদের মতো হিন্দু সন্ন্যাসীদেরকেও বৃত্তি প্রদান করতেন। শাসনব্যবস্থায় সুলতান সর্বেসর্বা হলেও তাঁর কয়েকজন উপদেষ্টা ছিল। তাঁরা প্রয়োজনে সুলতানকে পরামর্শ দিতেন। তিনিই প্রথম বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল একত্র করে সারা বাংলাদেশের একচ্ছত্র স্বাধীন সুলতান হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। আধুনিক অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, ইলিয়াস শাহের রাজত্বকাল থেকেই সারা বাংলাদেশের নামকরণ হয় বাঙালা এবং এর অধিবাসীরা পরিচিতি হয় বাঙালি নামে। ইলিয়াস শাহ একজন অভিজ্ঞ কূটনীতিবিদও ছিলেন। ইলিয়াস শাহ্ যখন দিল্লির বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রয়োজন হয়েছে তখন তিনি বীরের মতো যুদ্ধ করেছেন। আবার সুলতান যখন সন্ধির প্রস্তাব করেছেন তখন তিনি তা উপেক্ষাও করেননি। সন্ধি স্থাপনের পর ইলিয়াস শাহ দূত ও উপঢৌকন প্রেরণ করে দিল্লির সুলতানের সাথে মিত্রতা রক্ষা করেন।

সিকান্দর শাহ ও গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ

ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিকান্দর শাহ ১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রায় ৩৪ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর এ সুদীর্ঘ রাজত্বকালে বাংলাদেশে মুসলিম শাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সিকান্দর শাহ সুশাসক ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন । তিনি সুফি ও দরবেশদেরকে শ্রদ্ধা করতেন। সুফি শেখ আলাউল হক ও শেখ শরফউদ্দীন ইয়াহিয়ার সাথে সিকান্দর শাহের সৌহার্দ্য ও পত্রালাপ ছিল। তাঁর রাজত্বকালে স্থাপত্যশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয় এবং তার সময় তৈরি আদিনা মসজিদ মধ্যযুগের বাংলার স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

আদিনা মসজিদ

গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ ১৩৯০–৯১ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাংলার ইতিহাসে তাঁর রাজত্বকাল নানা কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করে। খ্যাতি ও সাফল্যের বিচারে তিনি ইলিয়াস শাহী বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবেও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ নিজে বিদ্বান ছিলেন। তিনি বিদ্বান, কবি ও সাহিত্যিকদের সমাদর ও শ্রদ্ধা করতেন। তিনি ফার্সি ভাষায় কবিতা লিখতেন। ইরানের কবি হাফিজের সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তিনি হাফিজকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানান। গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ বাংলা সাহিত্যেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালেই প্রথম বাঙালি মুসলিম কবি শাহ মুহম্মদ সগীর তাঁর কাব্য *ইউসুফ জোলেখা* রচনা করেন। গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ তাঁর পিতা ও পিতামহের মতই মুসলমান সুফি ও দরবেশদেরকে ভক্তি করতেন। তাঁর সমসাময়িক

সুফিদের মধ্যে শেখ নূর কুতব আলম প্রসিদ্ধ ছিলেন। চৈনিকসূত্র থেকে জানা যায় যে, গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ চীন সম্রাটের নিকট দূত ও উপহার পাঠিয়েছিলেন। চীন সম্রাটও বাংলাদেশের সুলতান ও তাঁর স্ত্রীর জন্য উপঢৌকন প্রেরণ করেন।

রাজা গণেশ ও ইলিয়াসশাহী বংশের শাসন (দ্বিতীয় পর্ব ১৪৩৬-১৪৮৭)

ইলিয়াসশাহী বংশের প্রথম পর্বের শাসনের পর বাংলার সিংহাসনে রাজা গণেশের উত্থান ছিল আকস্মিক ও বিস্ময়কর। একজন জমিদার হিসেবে বাংলার সুলতানের দরবারে তাঁর প্রভাব ও আসা-যাওয়া ছিল। তিনি সুলতানের একজন ঘনিষ্ঠ আমাত্য ছিলেন। শিহাবুদ্দিন নিহত হলে সৃষ্ট শূন্যতার সুযোগে তিনি বাংলার ক্ষমতা দখল করেন। গণেশের শাসনের শুরুতেই মুসলিম দরবেশদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ দেখা দেয়। দরবেশদের নেতা নূর কুতুব-উল-আলমের আহ্বানে সাড়া দিয়ে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কি বাংলা আক্রমণ করেন। রাজা গণেশ নতি স্বীকার করে কুতুব-উল-আলমের সঙ্গে আপস করেন। এরফলে গণেশের পুত্র জদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জালালুদ্দিন মাহমুদ শাহ নাম ধারণ করে বাংলার সিংহাসনে বসেন। তিনি পাণ্ডুয়া থেকে রাজধানী গৌড়ে নিয়ে যান। ১৪৩১ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তার ছেলে শামসুদ্দিন আহমদ শাহ ক্ষমতায় বসেন। তার ৫ বছর শাসনের ফলে সকলে তার প্রতি হতাশ এবং বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন। এ অবস্থায় ১৪৩৬ সালে সাদী খান ও নাসির খান নামক সুলতানের দুজন ক্রীতদাস তাকে হত্যা করেন। তারা ক্ষমতা দখল করলে অভিজাত ব্যক্তিরা বিদ্রোহ করেন। সাদী খান ও নাসির খানকেও হত্যা করা হয়। এর ফলে গণেশের বংশধরদের শাসনের ইতি ঘটে। অভিজাতদের গৃহযুদ্ধের এই সংকটকালে ১৪৩৬ সালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের প্রপৌত্র নাসিরউদ্দিন মাহমুদ। শুরু হয় ইলিয়াসশাহী বংশের দ্বিতীয় পর্বের শাসন যা ১৪৮৭ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ প্রথম বাঙালি মুসলিম কবি শাহ মুহাম্মদ সগীরের কবিতাংশ সংগ্রহ করবেন এবং এর উপর দলবেঁধে আলোচনা করবেন।

সারসংক্ষেপ

এই দেশে শাহ-ই-বাঙ্গালাহ খ্যাত সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলাকে একত্র করেন। তার সময় থেকে বাঙালা ও জনগণ বাঙালি হিসেবে পরিচিত হয়। তিনি ছিলেন উদার, সব ধর্মের মানুষের প্রতি তার সম্মান দৃষ্টি ছিল। তার মৃত্যুর পর সিকান্দার শাহ ও গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ সিংহাসনে বসেন। এই সময় বাংলায় রাজা গণেশ নামক এক জমিদার ও আমাত্য স্বল্প সময়ের জন্যে বাংলার শাসক হন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন ঐতিহাসিক ইলিয়াস শাহকে "শাহ-ই-বাঙ্গালাহ্" উপাধিতে ভূষিত করেন
- ক) মিনহাজ উস সিরাজ
- খ) জিয়াউদ্দিন বারানি
- গ) শামস সিরাজ আফীফ
- ঘ) আবুল ফজল

২। শাসক হিসেবে ইলিয়াস শাহ কেমন ছিলেন?
- ক) জ্ঞানী
- খ) অদক্ষ
- গ) অযোগ্য
- ঘ) বিচক্ষণ

৩। "গিয়াস উদ্দিন" এই উপাধি গ্রহণ নিচের কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যথার্থ?
- ক) ইলিয়াস শাহ
- খ) আজম শাহ
- গ) ফিরোজ শাহ
- ঘ) মোবারক শাহ

পাঠ-৬.৩ হোসেন শাহী বংশের অধীনে বাংলা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আলাউদ্দীন হোসেন শাহ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- হোসেন শাহী বংশের সময় কেন বাংলার স্বর্ণ যুগ ছিল সে বিষয়ে বলতে পারবেন।
- বাংলায় আফগান শাসন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	আলাউদ্দীন হোসেন শাহ, হাবশি, স্বর্ণযুগ, নৃপতি তিলক, শ্রী চৈতন্য

আলাউদ্দীন হোসেন শাহ

বাংলাদেশের ইতিহাসে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ এক উজ্জল অধ্যায়ের সূচনা করেন। তিনি সামান্য অবস্থা থেকে নিজ যোগ্যতায় বাংলাদেশে হাবশি শাসনের অবসান ঘটিয়ে হোসেন শাহী বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জনপ্রিয় সুলতান ছিলেন এবং তাঁর খ্যাতি বাংলাদেশের জনস্মৃতিতে বহুকাল ছিল। তিনি আরবদেশীয় ও সৈয়দ বংশের লোক ছিলেন। তিনি মক্কা থেকে বাংলাদেশে এসে নিজ প্রতিভা ও কর্মদক্ষতা গুণে হাবশি সুলতান মুজাফফর শাহের রাজত্বকালে উজীর পদ লাভ করেন। মুজাফফর শাহের কুশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে প্রধান প্রধান অমাত্য ও সৈন্যরা তাঁকে হত্যা করে সবাই মিলিত হয়ে হোসেন শাহকে সুলতান মনোনীত করেন। ১৪৯৩ সালে হোসেন শাহ 'আলাউদ্দীন হোসেন শাহ' উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। একারণে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ আলাউদ্দীন হোসেন শাহকে মধ্যযুগের 'গোপাল' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

শান্তি প্রতিষ্ঠা ও রাজ্য জয়

সিংহাসনে আরোহণ করার পর আলাউদ্দীন হোসেন শাহ দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি হাবশিদের প্রভাব থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য তাদের পরিবর্তে সৈয়দ, আফগান, মোঙ্গল ও হিন্দুদেরকে উচ্চ রাজ পদে নিযুক্ত করেন। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় তিনি অভিজ্ঞ রাজকর্মচারী নিযুক্ত করেন এবং তাদেরকে যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদান করেন। তিনি রাজধানী দিনাজপুর জেলার একডালায় নিয়ে আসেন।

জৌনপুরের বিতাড়িত সুলতান হোসেন শর্কীকে আশ্রয় দেওয়ার কারণে দিল্লির সুলতান সিকান্দর লোদী ক্রুদ্ধ হয়ে ১৪৯৫ সালে হোসেন শাহের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। তবে শেষ পর্যন্ত কোনো যুদ্ধ হয়নি। দুপক্ষই সন্ধি স্থাপন করে। সন্ধিতে উভয়পক্ষই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, কেউ কারো শত্রুকে আশ্রয় দিবে না। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ সমগ্র উত্তর বিহার এবং দক্ষিণ বিহারের কিছু অংশ দখল করেছিলেন। তিনি ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে কামতা রাজ্য আক্রমণ করে দখল করেন। এরপর তিনি কামরূপ আক্রমণ করেন। কিন্তু তাঁর এ অভিযান ব্যর্থ হয়। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ উড়িষ্যায় অভিযান পরিচালনা করেন। ত্রিপুরার রাজামালা থেকে জানা যায় যে, তিনি ত্রিপুরার কিছু অংশ অর্থাৎ বর্তমান কুমিল্লা জেলা অধিকার করেছিলেন। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ আরাকান অভিযানেও তিনি সাফল্য লাভ করেন। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম অধিকার করেন।

আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ও বাংলার স্বর্ণযুগ

সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ প্রজাদের কল্যাণের জন্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করতেন। তিনি গরিব-দুঃখীদের জন্যে দেশে অনেক লঙ্গরখানা স্থাপন ও পানির কূপ খনন করেন। শাসন ব্যবস্থার ব্যাপারে তিনি উদার নীতি গ্রহণ করেন।

তিনি মুসলমান ও হিন্দুদেরকে সমান চোখে দেখতেন এবং যোগ্যতানুসারেই সব সম্প্রদায়ের লোককে উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করতেন। হিন্দু রাজকর্মচারীদের মধ্যে উজীর পুরন্দর খান, মন্ত্রী রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী, সেনাপতি গৌর মল্লিক, রাজচিকিৎসক মুকন্দ দাস, দেহরক্ষী কেশবছত্রী, টাকশালের অধ্যক্ষ অনুপ-এর নাম জানা যায়। হিন্দু লেখকগণ আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সুশাসনে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'নৃপতি তিলক', 'জগৎভূষণ', 'কৃষ্ণাবতার' প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করেন।

আলাউদ্দীন হোসেন শাহ একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। তিনি বহু মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও খানকাহ নির্মাণ করেন। তিনি সুফি ও দরবেশদেরকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি পাণ্ডুয়াতে শেখ নূর কুতব আলমের দরগাতে বহু অর্থ দান করেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যদেবকে সম্মান করতেন এবং তাঁকে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে সুবিধা দিয়েছিলেন। হোসেন শাহ বাংলা সাহিত্যেরও পৃষ্ঠপোষকতা করে বাংলা ভাষাকে রাজদরবারে স্থান দেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় বহু আরবি, ফার্সি ও সংস্কৃত গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়।

বড় সোনা মসজিদ, গৌড়

ছোট সোনা মসজিদ, গৌড়

বাংলাভাষায়ও অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। যেমন রূপ গোস্বামী সুলতানের উৎসাহে বিদগ্ধ মাধব ও ললিত মাধব নামে দুটি বই লেখেন। এ সময়ে বিজয়গুপ্ত পদ্মপুরাণ বা মনসা মঙ্গল, বিপ্রদাস মনসা বিজয় এবং যশোরাজ খান শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্য রচনা করেন। মালাধর বসু শ্রীমদ্ভাগবত বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ বিজয় নামে আর একটি কাব্যও রচনা করেন। তাঁর রাজত্বকালে নির্মিত মসজিদসমূহের মধ্যে গৌড়ের 'ছোট সোনা' মসজিদ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

ড. আবু মুহাম্মদ হবিবুল্লাহ-এর মতে মধ্যযুগীয় বাঙ্গার ইতিহাসে সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। দীর্ঘ ২৬ বছর রাজত্ব করার পর আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

বাংলায় আফগান শাসন

১৫৩৮ সালে শেরখান গৌড় জয় করে বাংলায় আফগান শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। আফগানরা ৩৮ বৎসর বাংলায় শাসন করে, এর মধ্যে মাত্র নয় মাস মুঘল সম্রাট হুমায়ুন গৌড় অধিকার করেন। তবে শেরখান (শেরশাহ) যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসনও অধিকার করেন। অতএব শেরশাহ ও তাঁর ছেলের সময়ে বাংলাদেশ দিল্লির একটি প্রদেশে পরিণত হয় । তবে ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে শেরশাহের ছেলে ইসলাম শাহের (সলীম শাহ নামেও পরিচিত) মৃত্যুর পর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায় এবং সেই থেকে মুঘল বিজয় পর্যন্ত স্বাধীন থাকে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণের আলাউদ্দীন হোসেন শাহের আমলে নির্মিত গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদের একটি ছবি আঁকতে হবে

সারসংক্ষেপ

আলাউদ্দীন হুসেন শাহ বাংলায় হোসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আরাকান ও চট্টগ্রাম দখল করেন। তার সময়ে যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হতো। তিনি বাংলাকে রাজদরবারের ভাষা হিসেবে স্থান দেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তিনি অনেক জনকল্যাণমূলক কাজও করেন। যে কারণে তাকে নৃপতি তিলক, জগৎভূষণ, কৃষ্ণাবতার বলা হতো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন শাসককে নৃপতি তিলক উপাধিতে ভূষিত করা হয়?

ক) গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ
খ) আলাউদ্দিন আলী শাহ
গ) ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ
ঘ) আলাউদ্দিন হোসেন শাহ

২। হোসেন শাহ কবি সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন কেন? (অনুধাবন)

ক) সুনামের জন্য
খ) খ্যাতি লাভের জন্য
গ) উৎসাহ প্রদানের জন্য
ঘ) সম্মান প্রদর্শনের জন্য

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

পুকুর পাড় গ্রামের মাতবর মোশাররফ সাহেব নিজ কাজের জন্য সকলের নিকট প্রিয়। উক্ত গ্রামে হিন্দু মুসলিমসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা থাকে শান্তিপূর্ণ সহবস্থানে। মাতবর সাহেব নিজে মুসলমান হলেও যোগ্যতা অনুসারে হিন্দু ধর্মবলম্বীদেরও বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। তার এ ধরনের উদ্যোগের ফলে এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সুবাতাস বইছিল।

৩। উদ্দীপকের মোশারফ সাহেবের কাজে মধ্যযুগের কোন সুলতানের কাজের প্রতিফলন দেখা যায়–

ক) আলাউদ্দিন হোসেন শাহ
খ) সিকান্দর শাহ
গ) গিয়াসউদ্দিন আজম
ঘ) আলাউদ্দিন ফিরুজ শাহ

৪। উক্ত সুলতানের কর্মকান্ডের ফলে–

i) বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ঘটে
ii) অদূরদর্শী রাজনীতির প্রতিফলন ঘটে
iii) দক্ষতার সাথে রাজকার্য পরিচালিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i
খ) i ও ii
গ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.৪ বাংলায় মুঘল শাসন ও বার ভূঁইয়া

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলায় মুঘল আক্রমণের সময় এদেশের রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- বাংলার বার ভূঁইয়াদের সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- ইসলাম খান চিশতী সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মুঘল, সম্রাট আকবর, বার ভূঁইয়া, ঈসা খান, মানসিংহ, ইসলাম খান চিশতী, নবাবী আমল, বাংলার মুঘল সুবেদার শায়েস্তা খান ও মুর্শিদকুলী খান

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বাংলায় মুঘল অভিযান

আকবরের সেনাপতি খান জাহান রাজমহলের যুদ্ধে জয়লাভ করে রাজধানী তাঁড়া অধিকার করেন। তবে সমগ্র বাংলা তখনো মুঘল অধিকারের বাইরে থাকে। প্রকৃতপক্ষে অনেক যুদ্ধ করেও আকবর বাংলাদেশ জয় করতে পারেননি। সমগ্র বাংলায় অধিকার প্রতিষ্ঠার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ফলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক আফগান এবং হিন্দু জমিদার এবং ভূঁইয়া ইত্যাদি স্বাধীন হয়ে যায় এবং কেন্দ্রীয় শক্তির শাসন অস্বীকার করে। মুঘলদের পক্ষে সহজে তাদের দমন করা সম্ভব হয়নি। একই সময়ে যেহেতু মুঘল শক্তি সারা বাংলায় কর্তৃত্ব স্থাপনে ব্যর্থ হয়, সেহেতু এই আমলকে ভূঁইয়াদের আমলও বলা যেতে পারে। ভূঁইয়াদের মধ্যে আবার বার ভূঁইয়া অত্যধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে।

মুঘল আক্রমণের সময় বাংলার রাজনৈতিক চালচিত্র

মুঘল সেনাপতি খান জাহান দাউদ কররানীকে পরাজিত করে মালদহ শহরের প্রায় ২৪ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ-পূর্বে তাঁড়ায় নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। যেটি বর্তমানে ভাগীরথী নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তবে প্রথমদিকে বাংলায় মুঘল অধিকার মালদহ-দিনাজপুর হয়ে উত্তরে ঘোড়াঘাট এবং পূর্বে করতোয়া পর্যন্ত সীমিত ছিল। বাংলায় মুঘলদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বড় বাধা ছিল ভাটি এলাকা। ভাটি মানে পূর্ববঙ্গের নিচু এলাকা। এটি পশ্চিমে ইছামতি নদী, দক্ষিণে পদ্মা নদী, পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্য, উত্তরে ময়মনসিংহ এবং উত্তর-পূর্বে সিলেটের বানিয়াচং।

ঈশা খাঁ

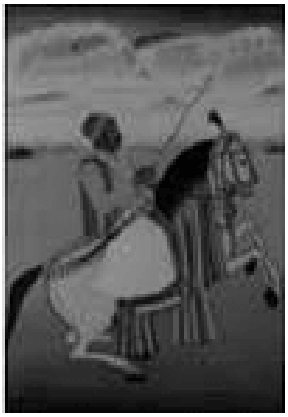

মানসিংহ

অর্থাৎ ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা ও সিলেটের নিম্নাঞ্চল নিয়ে ভাটি গঠিত। ভাটির জমিদারদের মধ্যে চাঁদ রায় ও কেদার রায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। আকবরের সেনাপতি মানসিংহ কেদার রায়কে পরাজিত করেন এবং যুদ্ধে আহত কেদার রায় প্রাণত্যাগ করেন। এরপর তার জমিদারি চলে যায় ঈসা খানদের দখলে। ভাটির জমিদারদের মধ্যে ঈসা খান ও তাঁর পুত্র মুসা খান ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তারা উভয়ে মুঘলদের দীর্ঘদিন প্রতিরোধ করতে সক্ষম হন। ঈসা খান বর্তমান বাক্ষণবাড়িয়ার সরাইলের জমিদার ছিলেন। ত্রিপুরার রাজা অমর মাণিক্যের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং ত্রিপুরার রাজার পক্ষ অবলম্বন করে তিনি বর্তমান সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলার তরফের জমিদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ঈসা খান ত্রিপুরার রাজার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন।

ক্রমশ শক্তিবৃদ্ধির পর ঈসা খান দিওয়ান ও মসনদ-ই-আলী উপাধি নেন। ঈসা খান জীবনের শেষ পর্যন্তও মুঘলদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেননি। ঈসা খানের রাজধানী ছিল কতরাব। এটা বর্তমান নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানার মাসুমাবাদ গ্রামের সঙ্গে অভিন্ন। সোনারগাঁয়েও ঈসা খানের আরেকটি রাজধানী ছিল। কতরাব থেকে সোনারগাঁয়ের দূরত্ব খুব বেশি নয়। মনে হয়, উভয় স্থানেই তিনি ঘাঁটি এবং রাজধানী স্থাপন করেন।

বাংলায় আকবরের শেষ সুবাদার ছিলেন রাজা মানসিংহ। তিনি ছিলেন রাজপুত এবং একজন দক্ষ সেনাপতি। মানসিংহ তাঁর ছেলে দুর্জন সিংহকে বিশাল বাহিনী নিয়ে ভাটি আক্রমণ করতে পাঠান। ব্রহ্মপুত্র তীরে এগারসিন্ধুতে ঈসা খান দুর্জন সিংহকে পরাজিত ও নিহত করেন। কথিত আছে যে, ঈসা খানের সাথে মানসিংহের একক যুদ্ধ হয়। জনশ্রুতি হচ্ছে যে, ঈসা খান মানসিংহকে একক যুদ্ধে আহ্বান করেন এবং ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধে জয়ী যিনি হবেন তিনিই বাংলার কর্তৃত্ব লাভ করবেন। মানসিংহ এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। মানসিংহ যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসেন এবং ঈসা খানের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। এক পর্যায়ে মানসিংহের তরবারি ভেঙ্গে গেলে ঈসা খান তাঁকে আঘাত না করে নিজের তরবারি মানসিংহকে দেন। কিন্তু, মানসিংহ তরবারি না নিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে আসেন। ঈসা খান তখন মানসিংহকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করলে তিনি তা গ্রহণ না করে ঈসা খানকে আলিঙ্গন করেন এবং তাঁর সাহস ও মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। মানসিংহ শিবিরে ফিরে গেলে তাঁর রাণী তাঁকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, মানসিংহের কাপুরুষতার জন্য সম্রাট মানসিংহকে হত্যা করবেন এবং রাণী বিধবা হয়ে যাবেন। ঈসা খান নিজে এই সমস্যার সমাধান করেন। তিনি মানসিংহের সাথে সম্রাটের দরবারে যেতে রাজি হন। সেখানে সম্রাট ঈসা খানকে বন্দী করেন। কিন্তু, মানসিংহের কাছে সকল কথা শুনে সম্রাট আকবর ঈসা খানকে উপাধি ও জায়গীর দিয়ে স্বদেশে ফেরৎ পাঠান।

ইসলাম খান চিশতী ও বারভূঁইয়াদের দমন

মুঘল সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে বসেন। তার পিতার নিযুক্ত সুবাদার মানসিংহকে বাংলার সুবাদারি পদে বহাল রাখেন। তবে ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর দুধ-ভাই কুতব-উদ-দীন খান কোকাকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করে পাঠান। কুতুব-উদ-দীন বর্ধমানের ফৌজদার আলীকুলীকে দমন করার জন্য বর্ধমানে গেলে সেখানে আলী কুলী ও কুতব-উদ-দীন উভয়েই নিহত হন। এই আলী কুলীর পরমা সুন্দরী স্ত্রী ছিলেন মেহের-উন-নিসা। আর এই মেহের-উন-নিসাই পরে জাহাঙ্গীরের স্ত্রীরূপে নূরজাহান উপাধি লাভ করেন। এরপর সম্রাট ইসলাম খান চিশতীকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করে পাঠান। ইসলাম খান চিশতীর মূল কৃতিত্ব হচ্ছে তিনি সমগ্র বাংলাদেশে এবং প্রতিবেশী কামরূপ এবং কাছাড়ে মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বার ভূঁইয়াদের দমন করেন এবং সকল ভূঁইয়া বা জমিদারকে পরাজিত করলে বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যের একটি সুবা বা প্রদেশে পরিণত হয়। ইসলাম খান চিশতী ছিলেন ফতেহপুর সিক্রির শয়খ সলীম চিশতীর পৌত্র, তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমবয়সী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।

সম্রাট আকবর

সম্রাট জাহাঙ্গীর

নূরজাহান

সুবাদার ইসলাম খান

মুঘলদের কামান, ওসমানী উদ্যান

ইসলাম খান বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থা পর্যালোচনা করে উপলব্ধি করেন যে, রাজধানী রাজমহল থেকে সারা বাংলাদেশের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখা সম্ভব নয়। তাই বাংলাদেশে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হলে রাজধানী স্থানান্তর করা প্রয়োজন। তিনি বুঝতে পারেন যে, নদীমাতৃক বাংলাদেশে সাফল্য লাভ করার জন্য নৌবহরকে শক্তিশালী করা দরকার। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইসলাম খান রাজমহল থেকে রাজধানী ঢাকায় নিয়ে আসেন। ইসলাম খান ১৬১০ সালে ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন এবং এর নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর। তিনি ইহতিমাম খানের অধীনে শক্তিশালী নৌবহর প্রতিষ্ঠিত করেন এবং স্থল ও নৌপথে বিভিন্ন ভূঁইয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে মুঘল বাহিনীর সাথে মুসা খান ও তার মিত্রবাহিনীর নৌযুদ্ধ শুরু হয়। মুঘল বাহিনী রাতে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে মুসা খান একাধিকবার পরাজিত হন। তার রাজধানী সোনারগাঁও মুঘল বাহিনী দখল করে। এ অবস্থায় মুসা খানও অনন্যোপায় হয়ে সুবাদার ইসলাম খানের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। এরপর চন্দ্রদ্বীপের রামচন্দ, যশোহরের জমিদার প্রতাপাদিত্য নিহত হন। অতঃপর ইসলাম খান ভুলুয়া বা নোয়াখালি রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। বুকাইনগরের আফগান জমিদার উসমান খান লোহানী মুঘলদের সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু ছিলেন। মুসা খান কর্তৃক মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করার পরও তিনি মুঘলদের আধিপত্য মেনে নেননি। সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলার হাইল হাওরের সন্নিকটে দৌলম্বপুর (বর্তমান লম্বোদপুর) নামক স্থানে ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে মুঘল বাহিনীর সাথে উসমান খানের ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে উসমান খান পরাজিত ও নিহত হন। ফলে সিলেট মুঘল বাহিনীর দখলে আসে। এভাবে ইসলাম খান বাংলার জমিদারদেরকে দমন করে বাংলাদেশকে সম্পূর্ণরূপে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

সুবেদার মীর জুমলা

১৬১৩ সালে সুবেদার ইসলাম খানের মৃত্যুর পর বেশ ক'জন সুবেদার বাংলার ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তবে সুবেদার মীর জুমলার ক্ষমতা গ্রহণ করার আগ পর্যন্ত কোন প্রশাসকই তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেননি। শাহ সুজাকে দমন করার জন্যে আওরঙ্গজেবের অন্যতম সেনাপতি মীর জুমলা বাংলার রাজধানী জাহাঙ্গীর নগর পর্যন্ত এসেছিলেন। ফলে দিল্লীর সিংহাসনে বসে আওরঙ্গজেব মীর জুমলাকে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত করেন। মাত্র তিন বছর শাসনকালে মীর জুমলা আসাম ও কুচবিহার বিজয় করেন। তিনি সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার জন্যে সে সময়কার বাংলাদেশে সুখ্যাতি অর্জন করেন। মীর জুমলার মৃত্যুর পর প্রথমে দিলীর খান ও পরে দাউদ খান অস্থায়ী সুবেদার হিসেবে বাংলা শাসন করেন। অবশেষে সম্রাট আওরঙ্গজেব তার মামা শায়েস্তা খানকে বাংলার সুবেদার করে পাঠান।

সুবেদার শায়েস্তা খান

শায়েস্তা খানের সুবাদারি আমল দুঅধ্যায়ে বিভক্ত ছিল। তিনি প্রথম অধ্যায়ে ১৬৬৪ খ্রিঃ থেকে ১৬৭৮ খ্রিঃ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৬৮০ খ্রিঃ থেকে ১৬৮৮ খ্রিঃ পর্যন্ত বাংলাদেশের সুবাদার ছিলেন। তিনি একজন দক্ষ সেনাপতি ও জনপ্রিয় সুবেদার ছিলেন। তার সময়ে আরাকানের মগ ও পর্তুগীজ (ফিরিঙ্গি) জলদস্যুরা মিলিত হয়ে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা এলাকায় লুটতরাজ করে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। তারা মানুষকে ধরে নিয়ে ইউরোপীয় বণিকদের নিকট বিক্রি করত। মগরা আবার অনেককে আরাকানে নিয়ে যেত এবং পুরুষদেরকে মজুরের কাজে লাগাত ও মেয়েদেরকে দাসী করে রাখত। তিনি মগ জলদস্যুদের বিতাড়িত করার জন্য বহু রণতরী নির্মাণ করেন এবং বিভিন্ন স্থান থেকে রণতরী সংগ্রহ করেন। চট্টগ্রাম থেকে মগদের বিতাড়ন ও চট্টগ্রাম জয় শায়েস্তা খানের সুবাদারির কৃতিত্বপূর্ণ কাজ। মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের ইচ্ছানুযায়ী চট্টগ্রামের নাম রাখা হয় ইসলামাবাদ।

আওরঙ্গজেব

শায়েস্তা খান

শুল্ক ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করলে ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে শায়েস্তা খানের প্রথম সংঘর্ষ ঘটে এবং ইংরেজরা বাংলাদেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। এভাবে তিনি ইংরেজ বণিকদের ঔদ্ধত্যের সমুচিত জবাব দেন। শায়েস্তা খান রাজস্ব সংস্কারে বড় ধরনের অবদান রাখেন। তাঁর সময়ে বাংলাদেশ কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। তখন বাংলাদেশে জিনিসপত্রের দাম খুব কম ছিল। কথিত আছে যে, তখন এক টাকায় আট মণ চাল বিক্রি হতো। তবে এটা ঠিক নয় যে, সাধারণ মানুষ ও কৃষকরা ভালো অবস্থায় ছিল। টাকার মান বেশি ছিল তাই চাল ছিল অনেক সস্তা। সাধারণ মানুষ টাকা ব্যবহার করত না। তারা ব্যবহার করত কড়ি। আর টাকা কড়ির ব্যবধান ছিল অনেক অনেক বেশি। শায়েস্তা খান ঢাকায় ছোট কাটরা, হুসায়েনী দালান, লালবাগ দুর্গের একাংশ এবং আরও বহু অট্টালিকা ও মসজিদ নির্মাণ করেন।

মুর্শিদকুলী খান ও নবাবী আমলের সূচনা

সম্রাট আওরঙ্গজেবের পর কোনো কোনো সুবা স্বাধীন হয়ে যায়। বাংলাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। বিশেষ করে মুর্শিদকুলী খানের সময় থেকে বাংলায় নবাবী আমলের সূচনা হয়। মুর্শিদকুলী খানের প্রাথমিক জীবন খুবই চমকপ্রদ। তিনি ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ সন্তান। সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁকে করতলব খান উপাধি দিয়ে ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার দিওয়ান নিযুক্ত করেন। পরে তিনি সুবেদার হন। মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব ব্যবস্থা ছিল যুগোপযোগী। তিনি অতিরিক্ত রাজস্ব ধার্য না করে সঠিক ব্যবস্থাপনার দ্বারা রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করেন।

সরফরাজ খান

মুর্শিদকুলী খান

আলীবর্দী খান

মুর্শিদকুলী খানের কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁর উত্তরাধিকার হিসেবে কন্যা জিনাত-উন-নেসার স্বামী সুজাউদ্দীন খান (১৭২৭-১৭৩৯ খ্রি.) বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সিংহাসনে বসেন। সুজাউদ্দীন খানের মৃত্যুর পর তার পুত্র সরফরাজ খান নবাব নিযুক্ত হন। কিন্তু সরফরাজ খানের বিরুদ্ধে বিহারের নায়েব আলীবর্দী খান বিদ্রোহ করেন। সরফরাজ খান এতে পরাজিত ও নিহত হন। মুঘলদের অনুমোদন ছাড়াই আলীবর্দী খান (১৭৪০-১৭৫৬ খ্রি.) বাংলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। নিজের নবাবীর উত্তরাধিকার নিয়ে তাঁর আপন কন্যাই তাঁর মনোনীত নবাব পৌত্র সিরাজকে গ্রহণ করেনি। নবাব পরিবারের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত বাংলা-বিহার-উড়িষ্যাই শুধু নয়, গোটা ভারতেরই স্বাধীনতা হারানোর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ মুঘল সেনাপতি মানসিংহ ও ঈসা খানের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের একটি কল্পিত ছবি এঁকে দেখান।

সারসংক্ষেপ

বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকজন দক্ষ নেতা বাধার সম্মুখীন হন। আকবরের সময় মানসিংহকে নিয়োগ দেয়া হলেও তিনি ঈসা খানের কাছে পরাজিত হলে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীকালে জাহাঙ্গীরের সময় ইসলাম খান চিশতী সমগ্র বাংলাদেশে মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। সুবেদার শায়েস্তা খান আওরঙ্গজেবের সময় বাংলা শাসনে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মানসিংহ কোন ভাটির জমিদারকে পরাজিত করেন–
ক) চাঁদ রায় খ) কেদার রায়
গ) ঈসা খান ঘ) মুসা খান

২। বাংলায় আকবরের শেষ সুবাদার কে ছিলেন?
ক) মানসিংহ খ) দুর্জন সিংহ
গ) ইসলাম খান ঘ) শায়েস্তা খান

৩। কোন সুবাদারের সময় রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় আনা হয়?
ক) শায়েস্তা খান খ) ইসলাম খান
গ) মুর্শিদকুলী খান ঘ) সুজাউদ্দিন

৪। এগারসিন্ধুতে দুর্জনসিংহকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে কোন নামটি অধিক উপযোগী?
ক) ইসলাম খান খ) সুমা খান
গ) ঈসা খান ঘ) ইহতিমাম খান

৫। জাহাঙ্গীর নগর নামটির সাথে সাদৃশ্য রয়েছে– (প্রয়োগমূলক)
ক) ঢাকার খ) চট্টগ্রামের
গ) বরিশালের ঘ) কুমিল্লার

সৃজনশীল প্রশ্ন

মুঘল শাসনামলে কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী গোলযোগপূর্ণ এলাকার সামরিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব ছিল জনাব x এর উপর। তিনি তার রাজধানী স্থানান্তর, নৌবহর গঠন কাজের সুবিধার্থে করেছিলেন। এমনকি নৌযুদ্ধে এলাকার বৃহৎ ভূস্বামীদেরও পরাজিত করেন।

ক. জাহাঙ্গীর কত সালে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন?
খ. শায়েস্তা খানকে অমরত্ব দিয়েছে তার স্থাপত্য কীর্তি-ব্যাখ্যা করুন।
গ. উদ্দীপকের জনাব x এর কর্মকান্ড পাঠ্য বইয়ের পঠিত সুবাদারের কাজের যে দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে তা ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. উক্ত সুবাদার জমিদারকে পরাভূত করে বাংলা সম্পূর্ণরূপে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন আপনি কী একমত? মতামত দিন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১ ঃ ১. ক ২. খ ৩. ক ৪. গ ৫. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২ ঃ ১. গ ২. ঘ ৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩ ঃ ১. ঘ ২. গ ৩. ক ৪. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪ ঃ ১. খ ২. ক ৩. খ ৪. গ ৫. ক